মূলপাতা

কষ্টকথা

Mohammad Toaha Akbar

2020-07-12 07:30:26 +0600 +0600

6 MIN READ

০

এই লেখাটা তীব্র কষ্টের। তাই অনুরোধ রইলো লেখাটা না পড়ার। সত্যি বলছি। এটা শুধুই নিজের জন্যে লেখা। নিজেকে কিছুটা বের করে দিয়ে একটু দম নেবার জন্যে স্বার্থপর একটা লেখা। পড়লে হয়তোবা দুমড়ে-মুচড়ে যেতে হবে, ভেঙ্গে যেতে হবে, গলা দিয়ে আর খাওয়া নামবে না, হাঁটতে কিংবা সালাত পড়তে গেলেই দুই চোখ মরিচ গোলা লোনা জলে ভরে উঠবে। পৃথিবীকে মনে হবে ভয়াবহ দুঃসহ কুৎসিত আর নোংরা-কদর্য পচা-গলা একটা জায়গা। মরে যেতে হবে যতোবার মনে পড়বে ঠিক ততোবার। কারণ, এই লেখাটার প্রতিটা ঘটনাই সত্য। নিজের চারপাশের মানুষের জীবন থেকে নেয়া। তাই আবারও নিষেধ করছি। তারপরেও যদি কথা না শুনে পড়তেই থাকেন, তাহলে আমন্ত্রণ জানাই এক বিষাদের জগতে।

১

ছেলেটার বয়স তিন-চার হবে। কিউট একটা বাবু। পাশের বাসায় খেলতে যায়। বারান্দায় হাঁটে। পিচ্চিটার বড় ভাই একদিন খেয়াল করলেন প্রতিবেশি তরুণ আদর করে কথা বলতে বলতে বাচ্চাটাকে বিশ্রীভাবে স্পর্শ করছেন। বাচ্চাটা বারবার কুঁকড়ে যাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু সে থামছে না। ভাইটা প্রচন্ড ধমক দিলেন।

শিশুরা কোথাও নিরাপদ না। কোথাও না। ছেলে শিশুরাও না।

২

মেয়েটার পাঁচ বছর বয়েসী মাথায় টুকটুকে একটা ঝুঁটি। আম্মু বেঁধে দিয়েছেন বোধহয়। কন্সট্রাকশানের কাজ দেখছে একমনে। মিস্ত্রীটা ডাকলো, “চকোলেট নিবা?” চকোলেট হচ্ছে মেয়েটার পৃথিবী। নেবে না মানে? ইতস্তত করলেও ছুটে না গিয়ে পারলো না। কিন্তু মিস্ত্রীটা এমন করছে কেনো? তার জামা কেনো খুলে ফেলছে? হাত দিচ্ছে কেনো এভাবে? “ছিঃ ছাড়েন আমাকে। আম্মুউউউউউ!” বলে চিৎকার দিলো সে। সবাই ছুটে এলে মিস্ত্রীটা পালালো। মেয়েটা বুঝেনি সেদিন কী হয়েছে। কিন্তু তবুও কাঁদতো সে। একটু বড় হয়ে যখন বুঝলো, তখন সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আরেকটু বড় হয়ে দেখলো পুরুষরা তার দিকে কীভাবে কীভাবে যেনো তাকায়! খুব বিশ্রীভাবে। ঘিনঘিন লাগে তার। পুরুষদের আগে ভয় পেতো, আর এখন তীব্র ঘেন্না করে সে। আম্মুকে বলেছে সে কোনদিনও বিয়ে করবে না। কোনদিন না। অসহায় মা চুপ করে থাকেন। তিনি যে সব জানেন, সব বুঝেন। চোখ দু’টো একসাথে ভিজে আসে মা-মেয়ের।

৩

চাকরীজীবি আম্মুটা ঘরে ফিরলেন। তার প্রতিবন্ধী ছেলেটা এবার চারে পা দিলো। ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারে না ছেলেটা। কী কষ্ট! কী কষ্ট! পুঁচকিটাকে সারপ্রাইজ দিতে আস্তে আস্তে করে রুমে গেলেন। দেখলেন তার আদরের বাচ্চাটা উপুড় হয়ে শোয়া। কাপড় নেই। ঘরের কাজের ছেলেটা নগ্ন হয়ে তার উপরে...

আর্তচিৎকার দিলেন আম্মুটা। কাজের ছেলেটা এক দৌঁড়ে পালিয়ে গেলো। আম্মুটা নির্বাক নিথর হয়ে বসে রইলেন। তার স্বপ্নের পুরো পৃথিবীটা যে আজ ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো তা কি কেউ কোনদিন বুঝতে পারবে?

৪

ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে জেগে উঠলো মেয়েটা। হাউমাউ করে আসা কান্নাটাকে মুখে-চোখে বালিশ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। হাই স্কুলে উঠার পর প্রথম বুঝতে পেরেছিলো ছোটবেলায় বাসার টীচারটা তাকে নিয়ে কেনো এমন করতো! সে আর কোনোদিন বিয়ে করতে চায়নি। তবুও তার ভালোর জন্যে তার মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিয়ে তাকে আরো ভেঙ্গে দিয়েছে এই সমাজ। সেই বিয়েতেও...

এই সমাজটাকে আজ সে ঘেন্না করে মন থেকে। একসময়ের সালাত, রোজা, পর্দা করা মেয়েটা আজ কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। চারপাশের সমাজ আজও তাকে ধর্মের কথা বলে। সে কথাগুলো বুঝতে পারে না। তার হিসেব মেলে না। সে এই সমাজকে চিনে। এই সমাজ অন্যায়কারীর বিচার কোনদিন করে না কোনদিন, করতেও চায় না। ভিক্টিমের উপর আরো আরো অত্যাচার করতে থাকে, করতেই থাকে, যতক্ষণ না মৃত আত্মা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষটা সত্যি সত্যি না মরে যায়। আরো একবার আত্মহত্যার প্ল্যান করছে সে। এই জীবনের অসহ্য ভার সে আর নিতে পারছে না।

৫

নিজের স্ত্রী আর সেই স্ত্রীর দুলাভাই মিলে তাকে বেঁধে ফেলেছে ভালভাবে। শক্ত করে। তারপর তার অসহায় গলাতে দড়ি লাগিয়ে ফাঁসিতে যখন ঝুলিয়ে দেয় দুইজনে মিলে, তখন কি রাজ্যের সব ক্ষোভ, অসহায়ত্ব আর ঘেন্না জমা হয়েছিলো ঝটপট করতে করতে মরে যাওয়া অসহায় মানুষটার দুই চোখে? নাকি সেই দু'চোখে কিছুই ছিলো না? হয়তো অবিশ্বাসের ঝাপটায় ব্ল্যাঙ্ক ছিলো। সব ব্ল্যাঙ্ক।

৬

শিশু মেয়েটা এখনো ঠিকমতো কথাও বলতে পারে না। একদিন কাঁদতে কাঁদতে বাথরুমে ঢুকে গোসল করতে লাগলো সে। আম্মু এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে মা? কাঁদো কেনো?" মেয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোনমতে বুঝাতে পারলো, তার যুবক কাজিন তার ইয়েতে হিসি করে দিয়েছে। সে ওগুলো ধুতে চাইছে। মায়ের চোখে আঁধার নেমে এলো। সেই কাজিনের বিচার হয়নি। বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। ছোট্ট মেয়েটা বড় হওয়ার পর কতোবার মরে গিয়েছিলো তা আজও জানা যায়নি।

৭

উচ্ছ্বল হাস্যোজ্জ্বল তরুণ ছেলেটা ভয় পায় আজ। খুব ভয়। অজানা এক ভয়। যে ভয় তাকে আমূল কাঁপিয়ে দেয়। সে আর ঘুমাতে পারে না। নিজের ভয়ের দেয়ালে কুঁকড়ে গিয়ে গুঁটিসুটি হয়ে পড়ে থাকে সে। রাতের বেলা ফুঁপিয়ে কান্না করে কাঁদে শুধু। আর কিই বা করবে সে? সে আর কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারে না। কোথাও বেড়াতে যেতে পারে না। কোথাও না। তীব্র অসামাজিক ছেলেটা এমন অসামাজিক কেনো? কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি। সবাই শুধু দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়, সামনে এগুতে বলে। সে পারে না। পারবেও না কোনোদিন আর। ঘরে ফিরেই চুপচাপ কোনোমতে দু'টো ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ে সে। রুমের লাইটটা নিভিয়ে দেয় যাতে আর কেউ না আসে, কথা না বলে। কোলবালিশটা নিয়ে দুই চোখ আর কান চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে থাকে সে। তার অসহায়ত্ব বুঝার যে আর কেউ নেই। কেউ শুনলেই যে হাসবে, উল্টো তাকেই দোষ দিবে সে এতো নরম বলে, লেডিস বা কাপুরুষ বলে। নিজের ছোটবেলার বন্ধুটাকে একদিন সব খুলে বলে সে। স-ব।

শুনতে শুনতে ঐ বন্ধুটাও নিস্তব্ধ বোবা হয়ে যায়। আর হাসতে পারে না। কথা বলতে পারে না। শুধু লিখতে পারে। তাই লিখে

যায়। কেবলই লিখে যায়। আলোর কথা। স্রোতের বিপরীতে হাঁটার কথা। স্রোতকে বদলে দেয়ার কথা।

o

যারা সবচাইতে বেশি কষ্টে ভোগে তাদেরই বোধহয় সবচেয়ে বেশি হাসতে হয়। যাতে অন্যের কষ্ট একটু হলেও মুছে যায়। যারা আঁধারে ঘিরে যাওয়া এই দুনিয়াকে চিনে ফেলেছে তারাই হয়তোবা সবচাইতে বেশি আলো জ্বালতে চায়। নিজের জীবনে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে বলে তারাই বেশি আশার কথা বলে, আশাকে ধারণ করতে চায়। যাতে তাদের মতো আর একটা প্রাণও আঁধারে না ডুবে যায়। কষ্টে না পুড়ে যায়। আর যেনো একটা আত্মাও এভাবে জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ আর ছাই না হয়ে যায়। আর না। একটাও না।

নিজে মরে গিয়ে হলেও অন্তত একটা মানুষের আত্মাকে বাঁচানোর জন্যে এদের এই আকুলতাটা কেউ কোনদিন বুঝবে না। সম্ভব না। এটা পুরোপুরি জেনে-বুঝেও এই মরা মানুষগুলো নিজের মরা-জঞ্জাল স্বপ্নের চিতার উপরে দাঁড়িয়ে নিজে জ্বলতে জ্বলতে অন্যকে আলো দিতে চায়। বুঝাতে চায়। কেউ বুঝে, কেউ বুঝে না। তাতে আর কিছু যায়ও আসে না।

নিজের জন্যে আগুন জ্বালানো যে হয়েই গেছে।

কী ভয়ংকর সেই আগুন!
কী যে দম বন্ধ করা আর দুঃসহ!

*** * ***

*1:18**PM** - **November** 28, 2018*